বাংলা গানের ইতিহাস

বাংলা গানের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করে আমরা জেনেছি যে বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য হল চর্যাপদ।

>> এই চর্যাপদগুলিও আসলে গান;

>> চর্যাপদ হল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনসঙ্গীত;

>> চর্যাপদ রচিত হয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকে;

>> চর্যাপদে গানের সংখ্যা ৫১;

>> চর্যার সঙ্গীতের অঙ্গ ৬ টি;

>> চর্যাগীতির বিভিন্ন রাগ - রামক্রী, মল্লারী, কামোদ।

>> চর্যার বাদ্যযন্ত্র - পটহ, মাদল, ডমরু, বীণা, একতারা।

চর্যাপদের পর বাংলা গানের ইতিহাসে যে গ্রন্থটির নাম করা যায় সেটি হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

>> এটি বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন।

>> এটি একরকমের নাটগীতি।

>> কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস।

>> মোট গান বা পদের সংখ্যা ৪১৮ টি;

>> মোট রাগ রাগিণী রয়েছে ৩২ টি।

এরপর একে একে আসে অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলি। অনুবাদ কাব্য যথা রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত গাওয়া হত পাঁচালির সুরে। আর মঙ্গলকাব্যগুলি গাওয়া হত কৈশিকি রাগে।

মধ্যযুগের বাংলা গানের ধারায় সবথেকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল বৈষ্ণব পদাবলি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে পদাবলি রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব পদাবলি সম্পর্কে দু-চার কথা -

>> অনুপ্রেরনা - জয়দেবের লেখা ‘গীতগোবিন্দ;

>> বিশিষ্ট পদকর্তা - চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ইত্যাদি;

>> মুসলমান পদকর্তা - শেখ ফয়জুল্লাহ সৈয়দ মুর্তাজা।

পদাবলি থেকে এল কীর্তন। কীর্তনের সাথে বাঙালি মাত্রই পরিচিত কারণ এখনো গ্রামেগঞ্জে কীর্তনের আসর বসে।

>> কীর্তনের অঙ্গ পাঁচটি - কথা, দোঁহা, আখর, তুক, ছুট।

>> কীর্তনের রসসংখ্যা ৬৪ টি।

>> কীর্তন গাওয়ার আগে গাওয়া হয় - গৌরচন্দ্রিকা।

>> কীর্তন সম্রাট বলা হত - নন্দকিশোর দাস'কে।

অষ্টাদশ শতকে এল আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের আরেকটি ধারা শ্যামাসংগীত। এর প্রথম এবং প্রধান কবি রামপ্রসাদ সেন। এরপর আসে আখড়াই, হাফ আখড়াই গান, কবিগান, টপ্পা, খেয়াল ও টপখেয়াল, ধ্রুপদ, ঢপকীর্তন এবং ঠুংরি। বাংলা টপ্পা

গানের জনক নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত। বাংলায় ধ্রুপদ চর্চা শুরু করেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। বাংলাদেশে দেশপ্রেমভাবনা প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় স্বদেশসঙ্গীত। প্রথম স্বদেশসঙ্গীত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সঙ্গীত' কবিতা।

উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে বাংলা গানে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগল। শুরু হল বাংলা গানের নতুন অধ্যায়। এই সময়ের কয়েকজন কাণ্ডারি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ, কাজি নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

এরপর বাংলা গানের ইতিহাস আলোচনায় যে নামগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল সলিল চৌধুরী, ক্যালকাটা ইউথ কয়্যার, ভি বালসারা, ভুপেন হাজারিকা, জগন্ময় মিত্র, শচিনদেব বর্মন এবং আরও পরবর্তীকালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, কিশোর কুমার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, নির্মলা মিশ্র প্রমুখ।

বাংলা সিনেমার গানঃ

বাংলা সিনেমায় প্রথম নেপথ্য/প্লে ব্যাক শুরু হয়েছিল ভাগ্যচক্র(১৯৩৫ সালে) ছবিতে। তারপর থেকে বাংলা সিনেমাতে গান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সত্যজিত রায়ের সিনেমাতেও গানের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সত্যজিত রায়ের ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন।

>> রবিশঙ্কর - পথের পাঁচালি, অপরাজিত

>> বিলায়েত খাঁ - জলসাঘর

>> সত্যজিত রায় - নিজের বাকি সব ছবি

শুধু সত্যজিত রায় নয়, খ্যাত অখ্যাত সকল বাংলা চিত্রপরিচালক তাদের ছবিতে গানের প্রয়োগ করেছেন। বাংলা সিনেমার গানের ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে।

বাংলা ব্যান্ডের গানঃ

তরুন প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে ব্যান্ডের গান খুবই জনপ্রিয়। বর্তমানে 'ভূমি', 'চন্দ্রবিন্দু', 'কালপুরুষ' প্রভৃতি ব্যান্ডগুলি বাংলা তথা ভারতের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করেছে। ব্যান্ডের গানের ইতিহাসটি এইরকম -

>>বাংলা তথা ভারতের প্রথম প্রাদেশিক ভাষার ব্যান্ড - মহীনের ঘোড়াগুলি

>>নেতা - গৌতম চট্টোপাধ্যায়

>> প্রথম অ্যালবাম - সংবিগ্ন পাখিকুল ও কলকাতা বিষয়ক গান

>>দ্বিতীয় অ্যালবাম - অ.উ. ব. বা অজানা উড়ন্ত বস্তু

বাংলা লোকসঙ্গীতঃ

বাংলা গানের প্রাণ লুকিয়ে আছে লোকসংগীতের সুরে। বাংলার লোকসঙ্গীতের প্রধান প্রধান ধারাগুলি হল-

*জারি - জারি কথার অর্থ 'ক্রন্দন'

*সারি - মাঝিমল্লারা সারিবদ্ধভাবে যে গান গায়

*ভাটিয়ালি - মাঝিমল্লাদের একক গান

*ঝুমুর - পুরুলিয়া সহ সমগ্র (ছোটনাগপুর)

*বাউল, ফকির, মুর্শিদি - পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে

পরিশেষে বলা দরকার, বাংলা গানের ইতিহাস একটিমাত্র পৃষ্ঠায় বলা কখনো সম্ভব নয়।

প্রশ্ন: বাংলা সঙ্গীতের ধারায় অতুলপ্রসাদ সেনের কৃতিত্ব আলোচনা কর ?

উত্তর: বাংলা সঙ্গীতের জগতে অতুলপ্রসাদ সেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি (১৮৭১ ১৯৩৪খ্রি:)। অতুলপ্রসাদ একধারে সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার, সঙ্গীত বিশারদ এবং শিল্পী ছিলেন। তাঁর রচিত গান গুলিকে ৫ টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় -

রাগাশ্রয়ী গান- গানের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাগ মিশ্রণের ফলে তাঁর রাগাশ্রয়ী গান গুলি অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। 'ডাকে কোয়েলা বারে বারে' 'মুরুলি কাঁদে রাঁধে রাঁধে' প্রভুত গানগুলি বিশেষভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

গজল, টপ্পা ও ঠুংরি- বাংলা ভাষার গজল রচনায় অতুলপ্রসাদ পথিকৃত ছিলেন। 'কে গো তুমি বিরহিণী', 'কত গান তো হল গাওয়া' প্রভৃতি গানগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর টপ্পা ও ঠুংরি গানে উত্তরপ্রদেশের কাজরি ও লগনী গানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

স্বদেশী সঙ্গীত- 'ওঠো গো ভারত লক্ষী', 'বলো বলো বলো সবে' প্রভৃতি স্বদেশ গীতিগুলি এখনো সমান জনপ্রিয়।

ঋতু সঙ্গীত- অতুল প্রসাদের অনেক গানে বিভিন্ন ঋতু সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। যেমন "বধুয়া নিদ নাহি আঁখিপানে", "আইল আজি বসন্ত মরি মরি" প্রভৃতি গানগুলি যথার্থ ঋতুসঙ্গীত হয়ে উঠেছে।

অনান্য উপরোক্ত শ্রেণী ছাড়াও অতুলপ্রসাদ বাউল কীর্তন, ভাটিয়ালি প্রভৃতি দেশজ সুরে বহু গান রচনা করেছেন। তাঁর লেখা গানগুলি "কাকলি","কয়েকটি গান", "গীতগুঞ্জ" এই তিনটি বইয়ে সংকলিত হয়েছে।

প্রশ্ন: বাংলা সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

উত্তর: বাংলা সঙ্গীতের ধারায় রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আর একজন সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজসভার দেওয়ান এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে খেয়াল চর্চাকারীদের মধ্যে অন্যতম। সেই সুত্রে দ্বিজেন্দ্রলালেরও ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের উপর বিশেষ দখল ছিল। ১৮৮৪ খ্রি: ইংল্যান্ডে বসবাসকালীন বিদেশি সুরের সান্নিধ্যে আসেন এবং নিজ প্রতিভাবলে সেগুলি আত্মস্থ করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, বাউল, স্বদেশী গান এবং প্যারোডি ভারতীয় সঙ্গীতের বিচিত্র শাখায় তাঁর অনায়াস বিচরন ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতের কমনীয়তা এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রানশক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে বেশী খ্যাতি নাট্যকার হিসেবে। প্রায় সমস্ত নাটকেই তিনি সার্থকভাবে গানের প্রয়োগ করেছেন। 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'রানাপ্রতাপ', 'মেবার পতন' প্রভৃতি নাটকগুলির গানও বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর 'সোরাবরুস্তম' নাটকটি বিদেশি অপেরার ঢঙে রচিত হয়েছিল। আবার কোরাস গানের প্রয়োগেও তিনি পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র দিলীপ কুমার রায় দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলিকে ৫ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা পূজা, দেশ, প্রেম, প্রকৃতি এবং বিবিধ। তার স্বদেশসঙ্গীতগুলির কারনেই দ্বিজেন্দ্রলাল চিরস্মরনীয় থাকবেন। 'ধনধান্যে পুষ্প ভরা', বঙ্গ আমার জননী আমার' প্রভূত গানগুলি বাঙালির অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। 'আর্যগাথা' গীতিসংকলনে তাঁর গানগুলি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

প্রশ্ন: ভারতীয় সঙ্গীতের টপ্পা গানের ধারাটি সম্পর্কে আলোচনা কর ?

উত্তর: ভারতীয় সঙ্গীতের একটি ধারা হল টপ্পা যা উনিশ শতকে বাংলায় প্রচলিত ছিল। পাঞ্জাবের লোকগান 'ডপা' বা টপে' থেকে টপ্পার সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এটি মুলত মেয়েদের গান। নরনারীর প্রেম এবং নারী হৃদয়ের আকুতি টপ্পা গানের বিষয়।

এই গানের বিশেষত্ব হল এগুলি স্থায়ী এবং আন্তরায় নিবদ্ধ এবং এর লয় দ্রুত। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসুত্রসার' অনুসারে টপ্পা শব্দের মূল অর্থ উল্লম্ফন বা লাফ, বিশিষ্ট অর্থে সংক্ষিপ্ত। ধ্রুপদ ও খেয়াল থেকে যে গান সংক্ষিপ্ততর তাই হল

টপ্পা। বাংলাদেশে টপ্পা গানকে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন নিধিবাবু বা রামনিধি গুপ্ত।

বাংলা টপ্পা গান

”আমি আর পারিনা সাধিতে এমন করিয়ে

কত মত কহিলেম মিনতি করিয়ে

তাহার কি করি বল না শুনে শুনিয়ে

যত দুঃখ মোর সখি তাহার লাগিয়ে

বৃথায় কি ফল বল সে কথা কহিয়ে।”

নিধুবাবু যে টপ্পা গান বাংলায় প্রচলন করেন তা দ্রুততান বর্জিত, জমজমাট এবং সুরের উল্লম্ফন পরিমানে অনেক কম ছিল। ‘গীতরত্ন' নামক গ্রন্থে নিধিবাবুর ৫৫৩ টি গান সংকলিত রয়েছে। তাঁর গানগুলি অন্তরের গভীর আবেগে পরিপূর্ণ। দ্রুত লয়ের পরিবর্তে বিলম্বিত লয়ে রচিত তাঁর গান গুলি হৃদয় স্পর্শ করে।

টপ্পাগানের আর একজন প্রবাদপ্রতিম শিল্পী হলেন কালীদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালিমির্জা। ইনি নিধুবাবুর থেকে বয়সে ছোট ছিলেন। কালিদাসের শিক্ষা বারাণসী, লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লিতে। নিধুবাবুর গানের সঙ্গে কালিদাসের গানের যে পার্থক্য ছিল তাঁর মূল কারন দুজনের পৃথক ঘরানা। কালিদাস বর্ধমান এবং গুপ্তি পাড়ায় তাঁর শিষ্য পরম্পরা তৈরি করেন। অম্বিকাচরণ, উমানাথ ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের অন্যতম। স্বয়ং রামমোহন রায় তাঁর শিষ্য ছিলেন। তাঁর ২৩৭ টি গান "গীতলহরী" নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়ে আছে।

প্রশ্ন: বাংলা গানের ধারায় রজনীকান্ত সেনের ভূমিকা ?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকালীন আর একজন বাঙ্গালি সঙ্গীত শেষরূজ্ঞর নাম হল রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)। বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ছোট ছিলেন। তবুও তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালে তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন। ‘বাণী' ও ‘কল্যাণী’ গ্রন্থদুটিতে রজনীকান্তের গানগুলি সংকলিত হয়ে আছে। তাঁর গানগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় -

স্বদেশ সঙ্গীত- ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই', ‘নমো নমো নমো জননী বঙ্গ' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক গান একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। যদিও সংখ্যায় কম তবুও তার স্বদেশ সঙ্গীতগুলি যথেষ্ট উৎকৃষ্ট মানের ছিল।

হাসির গান- রজনীকান্ত বেশকিছু হাসির গান লিখেছিলেন ‘যদি কুমড়োর মতো চালে ধরে রতো/ পান্তুয়া শত শত' প্রভৃতি গান এই শ্রেণীতে পড়ে।

ভক্তিগীতি: রজনীকান্ত মুলত তার ভক্তিগীতির জন্য বাঙালির হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার লেখা ভক্তিগীতিগুলি বাণী, সুর, ভাব, কাব্যমাধুর্য, নিজস্বতা এবং সহজ চলনের জন্য বাংলা গানের ভুবনে বিশিষ্ট হয়ে আছে। এই পর্যায়ের একটি বিশিষ্ট গান হল - ‘তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।'

বাঙ্গালী সমাজে রজনীকান্ত সেন ‘কান্ত কবি' এবং তাঁর গান ‘কান্তগীতি’ নামে প্রসিদ্ধ। অনুপ ঘোষাল, পান্নালাল ভট্টাচার্য, হেমন্ত ভট্টাচার্য, সন্ধা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য শিল্পীরা কান্তগীতি গেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

প্রশ্ন: রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর: রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় তিনি কবি। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠাকারী বিশ্ববরেণ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সাহিত্য এবং শিল্পের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তিনি স্বাক্ষর রাখেননি। বাংলা গানের জগতেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি মাইলফলক বিশেষ! তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার, শিল্পী এবং সঙ্গিত বিশারদ। আনুমানিক ২২৩২ টি গান তিনি রচনা করেছিলেন যেগুলি ‘গীতবিতান' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ‘স্বরবিতান' গ্রন্থের ১৯৩১ টি গানের স্বরলিপি তাঁরই তৈরি করা। সুর এবং বাণীর দিক থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

ধ্রুপদ ও ধামার- রবীন্দ্রনাথ মোট ৭৭ ধ্রুপদ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযেগ্যে হল ‘প্রথম আদি তব শক্তি', ‘মহাবিশ্বে মহাকাশে' প্রভৃতি।

খেয়াল ও ঠুংরি- হিন্দি খেয়াল ও ঠুংরির অনুসরনে উচাঙ্গ সঙ্গীতে ব্যাবহার করে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ৩০০ গান সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য মৌলিক খেয়াল ও রয়েছে ৫৫ টির মতো। তাঁর রচিত দুটি খেয়াল হল 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে', অনেক দিয়েছ নাথ' প্রভৃতি।

টপ্পা- রবীন্দ্রনাথ হিন্দি টপ্পা অনুসরণে ১৪ টি এবং নিজস্ব শৈলীতে ২৫ টি টপ্পা গান রচনা করেছেন। যেমন ‘তবু মনে রেখো“ প্রভৃতি।

লোকসঙ্গীত- ‘পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে', ‘মেঘের কোলে কোলে' প্রভৃতি লোকসঙ্গীত আজও সমান জনপ্রিয় হয়ে আছে।

ভাঙ্গাগান- হিন্দি এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সুরে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ যেসকল গান রচনা করেছিলেন সেগুলি ভাঙ্গাগান নামে পরিচিত। যেমন ‘বড় আশা করে', ’ফাগুন লেগেছে বনে বনে' প্রভৃতি। উপরের ভাগগুলি ছাড়াও বিষয় বিশিষ্ট অনুসারে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকে নানা ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, প্রেম সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক, শিশু সঙ্গীত প্রভৃতি।

প্রশ্ন : বাংলা গানের ধারা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর : সংগীত কথার অর্থ: ‘সংগীত’ কথার অর্থ হল গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই ত্রয়ের সমন্বয়। এর ব্যুৎপত্তি হল- সম্ +গৈ +ত।

সংগীতের আদি নিদর্শন:

সংগীত চর্চার সূত্রপাত ঠিক কবে, কোথায় সেই বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা অসম্ভব। তবে ইতিহাসের নানা তথ্যানুসারে বোঝা যায় প্রকাক বৈদিক যুগে সংগীতচর্চার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। পন্ডিতগণ আগে তাঁর অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে পুরাণাদি থেকে প্রমাণিত “মহাদেবই আদি সঙ্গীত গুরু। ব্রহ্মা প্রথমে মহাদেবের নিকট হতে সংগীত বিদ্যা শিক্ষা করে তাঁর পঞ্চশিষ্য ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু এবং তম্বুরকে শিক্ষা দেন। পরে ভরতমুনি পৃথিবীতে সংগীত প্রচার করেন।”

প্রাকবৈদিক যুগে সংগীতচর্চার নমুনা মেলে হরপ্পা ও মহেন-জো-দারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে। সেখানে পাওয়া গেছে নানা বাদ্যযন্ত্র নিত্যশীলা নারী মুর্তি, নর্তকের ভগ্নমুর্তি ইত্যাদি। পরে বৈদিকযুগে ঋকবেদেও উল্লেখিত আছে মৃদঙ্গ, ডুমুর ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। সামবেদেও আছে নৃত্য-গীত-বাদ্যের উল্লেখ। ভারতীয় সংগীতের আদি জননী হিসাবে বৈদিক যুগের সামমান বিশেষ জনপ্রিয়। বৈদিক পরবর্তীকালে ভরত তাঁর ‘নাট্যশাস্ত্র’-এ বিভিন্ন সাংগীতিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

অনুরুপ সংস্কৃত কবি কালিদাসের নানা রচনা (মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশম প্রভৃতি), বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত, হরিবংশ পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে সংগীত চর্চার যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। শাঙ্গদেব তার ‘সংগীত রত্নাক’ গ্রন্থে বলেছেন- “গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।”

ভারত তথা বাংলার যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র: ভারত তথা বাংলার যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) তারযন্ত্র (২) বাঁশির মতো ফুঁ দিয়ে বাজানো যায় (৩) খোল, ঢোল, তবলার মতো মধ্যে ফাপা, একদিক বা দুদিক চামড়া বা অন্য আচ্ছাদনে ছাওয়া তালবাদ্য (৪) ধাতুনির্মিত কর্তাল, ঘুঙুর, খঞ্জনি জাতীয় নিরেট ও ঘন তাল যন্ত্র বা তালবাদ্য।

বাংলা গানের আদি নিদর্শন:

বাংলা গানের আদি নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাপদে। চর্যা গানগুলি মুখ্যত বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকের সাধন পদ্ধতিমূলক গান। বাংলা গানের প্রধান দুটি ধারা – (i) ব্যক্তিসৃষ্ট (ii) লোকসংগীত।

চর্যাগীতি ব্যবহৃত রাগ রাগিনী: চর্যাগীতি মোট ১৫ রকমের রাগের ব্যবহার আছে। চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত কয়েকটি রাগের নাম হল- পট মঞ্জরী (সর্বাধিক ১১টি গান), গবড়া/গউড়া, গুর্জরী, বঙ্গাল, দেবক্রী, দেশাঘ, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, মালসী, মল্লারী প্রভৃতি। চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত কামোদ ও ভৈরবী রাগ সমনামে এখনও প্রচলিত। চর্যায় ব্যবহৃত দেবক্রী গীতগোবিন্দে রামকিরী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রামগীরি এবং বর্তমানে রামকেলী নামে প্রচলিত। মল্লারী রাগই আজকের মল্লার। চর্যাগীতিতে

ব্যবহৃত কিন্তু বর্তমানে কয়েকটি বিলুপ্ত রাগের নাম হল- দেবক্রী, গউরা, মালসী, শবরী, বঙ্গাল, অরু, কাহ্ন, গুর্জরী। চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের নাম হল- পটহ বা ঢোল, মাদল, করন্ত, কসাল, ডুমুর, বীণা, একতারা প্রভৃতি।

আদি মধ্যযুগীয় বাংলা গানের নিদর্শন:

আদি মধ্যযুগে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বাংলা গানের নিদর্শন পাওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে মোট পদের সংখ্যা ৪১৮টি এবং মোট রাগরাগিনীর সংখ্যা ৩২টি। আলোচ্য কাব্যে ব্যবহৃত কয়েকটি রাগ রাগিনী হল- আহের, কুকু, কহু, কহুগর্জরী' কেদার, কোড়া, কোড়াদেশাগ, বসন্ত, বিভাগ, বেলাবলী, ভাটিয়ালী, ভৈরবী, মল্লার প্রভৃতি।

পাঁচালি:

দেব মহাত্মসূচক কাহিনীধর্মী গানকেই পাঁচালী বলা হয়। মধ্যযুগে রামায়ন, মহাভারত ও ভাগবত থেকে অনূদিত আখ্যায়িকাগুলি গাওয়া হতো পাঁচালীর সুরে। পাঁচালী মূলত বাংলার লোকগানেরি বিশিষ্ট একটি সুর। লৌকিক সুর বলেই কোনো প্রাচীণ গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়না। আধুনিক পাঁচালী গানের রূপকার লক্ষ্মিকান্তি বিশ্বাস ও গঙ্গানারায়ণ নস্কর। লক্ষ্মীকান্তই পাঁচালী গানে শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের ব্যবহার করেন। তবে পাঁচালী গানের রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাগ্রগন্য দাশরথি রায়। এছাড়া ঠাকুরদাস দত্ত, রসিকচন্দ্র রায়, ব্রজমোহন রায়, আনন্দ শিরোমনি প্রমুখ পাঁচালীকারেরাও স্মরণীয়।

মঙ্গলগীতি:

বাংলাদেশের এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য লেখা হয়েছিল আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে যা 'মঙ্গলকাব্য' বা 'মঙ্গলগীতি' নামে পরিচিত। মঙ্গল বিধায়ক দেবদেবীর মহাত্ম কথা নিয়ে এগুলি লেখা। 'লাচাড়ি' নামক লৌকিক ছন্দেই মঙ্গলকাব্যগুলি গাওয়া হয়। 'বোট্টা' রাগে গীত। মঙ্গলগীতির মধ্যে বিশেষ মনসাগীতি এখনও রাঢ়বঙ্গে 'ঝাপান', দক্ষিণবঙ্গে 'ভাসান', পূর্ববঙ্গে 'রয়ানী' এবং উত্তরবঙ্গে 'ভগজিয়ানী' / 'মড়াকিয়ানী পালা' নামে পরিচিত।

বৈষ্ণবগীতি:

মধ্যযুগে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে যে সমস্ত গান রচিত হয়েছে তাকেই বৈষ্ণবগীতি বলা হয়। বৈষ্ণব গীতিতে বাঙালী হৃদয়ের গীতিময়তা প্রাণ পেয়েছিল। কয়েকজন বৈষ্ণব গীতিকার হলেন বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ।

কীর্তন:

বৈষ্ণব পদাবলীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে কীর্তন গান। ঈশ্বরের নাম, লীলা ও গুণাবলির উচ্চঃস্বরে ঘোষণাকেই বলা হয় কীর্তন। খোল ও কর্তাল সহযোগে গীত হয় বলে কীর্তনকে সংকীর্তন নামেও অভিহিত করা হয়। চৈতন্যদেব স্বয়ং কীর্তনকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- (i) নাম কীর্তন বা সংকীর্তন (ii) লীলা কীর্তন বা রস কীর্তন। নামকীর্তন সকলের জন্য কিন্তু রসকীর্তন শুধু রসিকদের অধিকার। লীলা কীর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি হল বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, ঝুলন, মাথুর, মান, সুবল মিলন প্রভৃতি। কীর্তনের পাঁচটি ভাগ। যথাক্রমে- কথা, দোঁহা, আখর, তুক ও ছুট। এছাড়া ঝুমুর নামেও ষষ্ট একটি অঙ্গের কথা পাওয়া যায়।

শাক্ত পদাবলী:

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ভারত তথা বাংলার শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। নবাবি অপশাসন বিলাস-ব্যসনমত্ততা স্থানীয় ভূস্বামীদের মাত্রাহীন শোষন ও অত্যাচার বর্গীর হাঙ্গামা, পোর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণ – সাধারণ বাঙালীর জোবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ। এই রকম সময়ে বাঙালীর হৃদয় আশ্রয় খুঁজল তাঁর পুরাতন মাতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যে। এই পর্যায়ের বিশিষ্ট ফসল শাক্ত পদাবলী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাতৃশক্তিকে ভর কেন্দ্র করে রেখে ভক্তি ও বাৎসল্যের যেসব পদ রচনা করা হয়। সেগুলি শাক্ত পদাবলী নামে চিহ্নিত। শাক্তপদাবলী মাতৃসংগীত, শ্যামাসঙ্গীত, চন্ডীগীতি, মালসীগান, আগমনি ও বিজয়া পর্বে বিভক্ত। শাক্ত সংগীতের প্রথম ও প্রধান কবি রামপ্রসাদ সেন। তাঁর সৃষ্ট সুর রামপ্রসাদী সুর নামে পরিচিত। এই ধারার অপর এক শক্তিমান গীতিকার হলেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (আঃ ১৭৭২-১৮২১)। তিনি 'আগমনি' ও 'বিজয়া' পর্যায়ের পদ রচনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেছেন। কয়েকজন অপ্রধান শাক্তসংগীত রচয়িতা হলেন দাশরথি রায়, আশুতোষ দেব, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, রামবসু, রূপচাদ পক্ষী, হরিদাস মজুমদার প্রমুখ।

কবিগান:

'কবিগান' বস্তুত এমন এক ধরনের গান যার রচয়িতারা সাধারণত উচ্চশিক্ষিত নন কিংবা বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত নন। 'উপস্থিত বুদ্ধি ও সহজাত কবিত্ব শক্তি'র সাহায্যে সভায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান রচনা করেন। কবিগান উত্তরপ্রত্যুত্তর বা সংলাপ ধর্মী গান। এখানে দুদলের মধ্যে চাপান ও উতোরের মাধ্যমে সংগীত প্রতিযোগিতা চলে। এখানে ব্যবহৃত হয় – ঢোল, কাসি ইত্যাদি। দেবদেবী লীলা, পৌরাণিক আখ্যান, সামাজিক সমস্যা, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি কবিগানের বিষয়। প্রধাণত কবিগানের চারটি পর্যায় – মালসী বা ভবানী বিষয়ক, সংখী সংবাদ, গোষ্ট ও লহর। কবিগানে 'খেউড়া' পর্যায়ে আদি রসাত্মক শব্দ সহযোগে নায়ক নায়িকার মিলন উদযাপিত হয়। এই গান ভক্তি ও বৈরাগ্য-উদ্দীপক সঙ্গীত'কে মালসী বলে। 'লহর' বলতে বোঝাতো ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ হাস্যরসাত্মক গান। 'গোষ্ঠ' সংগীতের বিষয় বালক কৃষ্ণের গোচারণ যাত্রা এবং মা যশোধর স্নেহ কাতরতা। ড. সুকুমার সেনের মতে আদিতে কবিগানের পর্যায়গুলি ছিল মালসী বা ভবানী বিষয়ক, সখী সংবাদ, খেউড়, প্রভাতী। ঈশ্বরগুপ্তের মতে গবিগানের তিনটি তুক রয়েছে। তাঁর মতে কবিগানের জন্মভূমি শান্তিপুর। আখড়াই থেকে কবিগানের সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কবিগানই বাংলার জাতীয় সাহিত্য। কবিগানের গৌরবময় শতবর্ষব্যপী স্বর্ণযুগের কবিয়ালদের মধ্যে গোঁজলা গুই, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, হরুঠাকুর, রামবসু, নীলঠাকুর, গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মাধবময়রা, ঈশ্বরগুপ্ত, জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতুরায়, নীলমণি পাটুনী, ভীমদাস মালাকার, উদয়চাঁদ সহ আরো অনেকেই স্মরণীয়।

আখড়াই গান:

আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' জানা যায় গায়ক বাদক ও নর্তকদের যৌথসম্প্রদায়কেআ আখড়া বলা হয়। শাস্ত্রীয় রাগতাল সমন্বিত প্রেম গীতিই পরিবেশন করতেন তারা। মনে করা হয় গৌড়বঙ্গে উদ্ভূত হয়ে, শান্তিপূর-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে অবস্থিতির পর অষ্টাদশ শতকে চুঁচুড়া হয়ে আখড়াই গান কোলকাতায় প্রবেশ করে। ঈশ্বর গুপ্তের মতে শান্তিপুরের খেউড় আর প্রভাতী গানের সমন্বয়ে আখড়াই গানের উৎপত্তি। প্রথম দিকে এই গান ছিল মূলত আদিবাসী রসাত্মক। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ও তাঁর আত্মীয় কুলুইচন্দ্র সেন আখড়াই গানের সংশোধন করেন। আখড়াই গানে রামনিধি গুপ্ত বা নিধিবাবুই (১৭৪১-১৮৩৯) শ্রেষ্ঠশিল্পী। এছাড়া অন্যান্য আখড়াই রচয়িতা হলেন রামঠাকুর, শ্রীদাম দাস, বাবুমোহন বসাক, হলধর ঘোষ প্রমুখ। আখড়াই গানে উক্তি-প্রত্যুক্তির ব্যপার ছিলনা।

হাফ আখড়াই:

কবিগানের মতধ হাফ আখড়াই প্রশ্নোত্তরমূলক ও সংলাপধর্মী। হাফ আখড়াই-এর প্রশ্ন অংশকে বলা হয় 'ধরতা' আর উত্তর অংশ হল উতোর। হাফ আখড়াই গানের প্রচলক হলেন নিধিবাবু শিষ্য গায়ক মোহনচাঁদ বসু। হাফ আখড়াই-এর পর্যায়গুলি হল- (১) ভবানী বিষয়ক বা শারদা বিষয়ক (২) সখী সংবাদ (৩) খেউড়। মোহনচাদের জীবনদশাতেই হাফ আখড়াই গানের ধারা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

তরজা ও খেউর:

তরজা গানও কবিগানের মতো চাপান উতোর বা প্রশ্নোত্তরমূলক। তরজা গান মূলত পৌরাণিক বিষয় নিয়ে লেখা হয়। এধরনের গান প্রধানত অশ্লীলতা বর্জিত। আবার তরজা গান শ্রোতা চাহিদামতো শ্লেশ ও অশ্লীলতায় ভরে যেত তাকে বলা হত খেউড়।

পাঁচালী গান:

'পঞ্চলিকা' শব্দ থেকে 'পাঁচালি' শব্দের উদ্ভব বলে মনে করা হয়। পাঁচালি ছন্দে পাঁচজন গায়ক চামর হাতে গান করতেন বলে অনেকে মনে করতেন তা থেকে 'পাঁচালি' নামকরণ। প্রথম দিকে পাঁচালি গান ছিল পল্লী গান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঁচালি গানের আঙ্গিকে রূপান্তর আসে। পাঁচালিতে আবৃত্তির সাথে গানের মিশ্রণ ঘটে।

ঢপ কীর্তন:

পাঁচালি ও কথারীতির সঙ্গে কীর্তন গানের মিশ্রণে ঢপকীর্তন সৃষ্টি। 'ঢপ' শব্দের অর্থ 'শুদ্ধ সৌষ্ঠব সম্পন্ন'। কৃষ্ণের নানালীলা ঢপকীর্তনে পরিবেশিত হয়। ঢপকীর্তনের প্রাচীণ গায়ক হলেন রূপচাদ অধিকারী। এছাড়া এধারার গায়ক হিসাবে নাম করেছিলেন অঘোর দাস, দ্বারিক দাস, শ্যাম দাস, মোহন সরকার, মধুসূদন কিন্নর।

পক্ষীর গান:

'পক্ষীর গা' বলতে বোঝায় রূপচাদ পক্ষী বা গৌরহরিদাস মহাপাত্র-এর গান। তিনি ছিলেন ঊনিশ শতকের একজন খ্যাতনামা সংগীত রচয়িতা। 'পক্ষীর জাতিমালা' নামে সখের পাঁচালী দল গড়ে তিনি খ্যাতি শীর্ষে উঠেন। উনিশ শতকের কোলকাতায় বাবু শতকের বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল পক্ষীর দলের গানে। পক্ষীর গানে কবি অ গায়কেরা পক্ষীর বিভিন্ন রূপ গান পরিবেশন করত। কথিত আছে, নবকৃষ্ণ দেবের পরিষদ শিবচন্দ্র টাকুর পক্ষীর দলের প্রতিষ্ঠাতা। ঈশ্বরগুপ্তের মতে শোভাবাজার বটতলা নিবাসী রামচন্দ্র মিত্রের আটচালায় বাবু রামনারায়ণ মিশ্র এই দলের প্রতিষ্ঠা করেন।

যাত্রাগান:

উৎসব উপলক্ষে গান ও গমনকেই বলে যাত্রাগান। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও 'যাত্রা' শব্দটির বর্তমান অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দী থেকে মোটামুটি আজকের চেহাড়ায় যাত্রা গানের প্রচলণ শুরু হয়। প্রথমযুগের যাত্রা ছিল কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কালক্রমে রামায়, মহাভারত, লোককথা, লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি অবলম্বনেও যাত্রা গানের প্রসার ঘটে। সংলাপের চেয়ে গানের আধিক্য থাকায় শুধুমাত্রা না বলে যাত্রাগান বলা হত। উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রাপালায় নতুন ধারার সংযোজনে যাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য তারা হলেন গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকোমল গোস্বামী, নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায়, গোপাল উড়ে ও মতিলাল রায়।

রামচাদ মুখোপাধ্যায় প্রথম ১৮৪৯ সালে 'নন্দবিদায়' যাত্রাপালার আখড়াই ও হাফ আখড়াই গানের প্রয়োগ করেন। মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রবর্তন করেন রাগ-রাগিনী সংবলিত 'জুড়ির গান'। গোপাল উড়ে দক্ষ টপ্পা গায়ক এবং বিদ্যাসুন্দর পালায় খেমটানাচ যোজনাও তাঁর কীর্তি।

হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীত:

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন কবিগান ও পাঁচালির তুঙ্গ জনপ্রিয়তা, তখন বাংলার চারভজন অবশ্য স্মরণীয় সঙ্গীতব্যক্তিত্ব ও পশ্চিমাকলাবাতের তত্ত্বাবধানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতচর্চায় ব্রতী হন। হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীত বলতে আমরা ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, খেয়াল, ঠুংরি কে বুঝব, এই চারজন হলেন রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯), কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালী মীর্জা (আঃ ১৭৫০-আঃ ১৮২০), দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) এবং রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (আঃ ১৭৬১-১৮৫৩)। এরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গুরুর কাছে সংগীতের নানা স্বতন্ত্র অঙ্গের সাধনায় সিদ্ধ হন। বস্তুত এই চারজনেরই প্রচেষ্টার ফলে বাংলা ভাষায় টপ্পা, ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি অঙ্গে সঙ্গীত রচিত হয় এবং বাংলাদেশে রাগসংগীতের প্রচলন ঘটে।

টপ্পা সংগীত:

উত্তর ভারতীয় রাগ সংগীতে ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংড়ির সঙ্গে টপ্পাও একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারো মতে টপ্পা হল পাঞ্জাবের উট চালকের গান। আবার কেউ মনে করেন টপ্পা গান এসেছে পাঞ্জাবী গ্রামীণ গান 'ডপা' থেকে। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থানুসারে 'টপ্পা' শব্দের আদি অর্থ 'লাফ'। এর গতি ও তান উল্লম্ফযুক্ত হওয়াতেই এইরূপ নামকরণ অনেকে মনে করেন। টপ্পার দুটি স্তবক বা টুপ স্থায়ী ও অন্তরা। এর সঙ্গে দ্রুত খেয়ালের গভীর সাদৃশ রয়েছে। টপ্পায় ভৈরবী, খাম্বাজ, কাঁফি, ঝিঝিট, পিলু প্রভৃতি রাগ ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত মেয়েদের গান। এর বিষয় নরনারী প্রেম এবং নারী হৃদয়ের আকুতি। কালীমীর্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) বাংলায় টপ্পা গানের প্রচলন করেন। 'গীতলহরী' নামের বইতে তাঁর ২৩৭ টি গান পরিলক্ষিত হয়েছে। নিধুবাবু ওরফে রামনিধিগুপ্ত ছাপরায় হিন্দুস্থানী গায়কদের কাছে টপ্পা শিখে বাংলা ভাষায় টপ্পা গান লেখেন। তাঁর যাবতীয় রচনা তিনটি সংস্করণে 'গীতরত্ন' নামে গীতিসংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সর্বমোট প্রকাশিত গানের সংখ্যা ৫৫৩ টি।এর মধ্যে ৫২৯ টি টপ্পা এবং ২৪টি আখড়াই সংগীত। কালী মীর্জা ও নিধুবাবুর চেষ্টায় বাংলায় টপ্পা জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

খেয়াল সংগীত:

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা খেয়াল। 'খেয়াল' আরবি শব্দ। এর অর্থ 'যথেচ্ছাচার'।মনে করা হয় আলি জাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্গত কৈবাড় থেকে খেয়ালের উৎপত্তি। অন্য মতে, একতালী ও রা

সক্ প্রবন্ধ খেয়ালের উৎস। অনেকে মনে করেন 'কাওয়ালী' নামক উত্তর ভারতীয় লোকসংগীত থেকেই খেয়ালের উৎপত্তি। সধারণ খেয়ালে স্থায়ী ও অন্তরা – এই দুটি তুক থাকে। বাংলাদেশে রঘুনাথ রায় প্রথম খেয়ালের চর্চাশুরু করেন। তাঁর খেয়াল চর্চার প্রায় ৩০ বছর পরে বিষ্ণুপুরের কানাইলাল ও মাধবলাল খেয়াল গাওয়া শুরু করেন। 'ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলী', 'সংগীত সার সংগ্রহ' ও 'বাঙালির গান' গ্রন্থে রঘুনাথ রায়ের রচনা সংকলিত আছে।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশে টপ্পা ও খেয়ালের মিশ্রণে মোটাদানার তান এবং গমক ও গিটিকিরির অলংকার সংবলিত এক শ্রেণির সংগীত সৃষ্টি হয়েছিল। এটি খ্যাত হয় টপখেয়াল নামে। জয়জয়ন্তী, বাগেশ্রী, ভীমপল্লশ্রী, বসন্ত, মূলতান, পূরবী, নটমল্লার, প্রভৃতি রাগ টপখেয়ালে ব্যবহৃত।

ধ্রুপদ সংগীত:

ভারতীয় রাগ সংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ধ্রুপদ, ধ্রুপদের গায়ন্ন শৈলী অনেক বেশি শাস্ত্রসম্মত এবং গাম্ভীর্যপুর্ণ। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজসভার শিল্পী তানসেনের কন্ঠেই ধ্রুপদের বিকাশ। এই যুগেই ধ্রুপদের সমাদর ছিল সব থেকে বেশি। মুঘল যুগীর অবসানে ধ্রুপদ শিল্পীরা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে আশ্রয় নিলেন এবং এই ধারা প্রতিষ্ঠা করলেন। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম বাংলায় ধ্রুপদ রচনা করেন। ভারতবর্ষে বহুদিন ধরে ধ্রুপদের প্রচলন থাকলেও অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে রামশঙ্করের হাতে বিষ্ণুপুরে এর প্রবর্তন এবং পরবর্তীকালে এই ধারাই বিষ্ণুপুর ঘরানা নামে পরিচিত হয়।

রামশঙ্করের শিষ্যদের মধ্যে সর্বাগ্রগন্য ছিলেন যদুভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। এই সময়ের আরেকজন বিশিষ্ট ধ্রুপদিয়া ছিলেন রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী। যদুভট্ট কিশোর রবীন্দ্রনাথের শিক্ষকতার সূত্রেও স্মরনীয় হয়ে রয়েছেন। অনন্তলালের চার কৃতী পুত্র ছিলেন- রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর, সুরেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ। রামপ্রসাদের লেখা ‘মৃদঙ্গদর্পণ’ বা ‘সঙ্গীতমঞ্জুরী’ প্রামাণ্যগ্রন্থের মর্যদা পায়। তবে এই বিষয়ক কীর্তিতে গোপেশ্বর এগিয়ে থাকবেন। তাঁর ‘ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস’, ‘সঙ্গীত চন্দ্রিকা’, ‘গীত প্রবেশিকা’, ‘তানমালা’, ‘বহুভাষী গীত’ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ধেউপদ শিক্ষার্থীদের পক্ষে অমূল্য সম্পন স্বরূপ। এই ঘরানার বিখ্যাত যন্ত্রী ও ধ্রুপদ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সুরবাহার, সেতার, এস্রাজ, ব্যাঞ্জো, কানন, নৌকাতরঙ্গ, কাষ্ঠতরঙ্গ, জলতরঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্রের বাদনে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।

কৃষ্ণনগরের বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীকে (১৮০৪-১৯০০) কেন্দ্র করে ধ্রুপদ ও বাংলা ভাষায় রাগ সংগীতের বিকাশ বিশেশভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। ১৮৩০ সালে রামমোহনের আহ্বানে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান ও কোলকারা আগমনের ফলে তারই প্রচেষ্টায় রাগভিত্তিক বাংলা ব্রহ্ম সংগীতের প্রচলন হয়। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল অগ্রজের তিনি গুরু। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীত শিক্ষক তিনিই।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ট্য পুত্র মাধব বীণাবাদক ছিলেন। সম্ভবত তিনিই বাংলার প্রথম বীণাকার। ধ্রুপদ অনুশীলনে গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ স্বীকৃতি পাবেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে স্বয়ং যদুভট্টও ছিলেন। খান্ডারবাণী রীতির ধ্রুপদ বাংলায় তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। বাংলায় দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের পর খেয়াল চর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছেন আর একজন দেওয়ান। কৃষ্ণনগরের কার্তিকেয় চন্দ্র রায়(১৮২০-১৮৮৫), ইনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা। ১৮৭৮ সালে তাঁর রচিত রাগাশ্রয়ী বাংলাগানের সংকলন ‘গীতমঞ্জরী’ প্রকাশিত।

ঠুংরি গান:

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আরেক ধরনের লঘুশাস্ত্রীয় সংগীত বাংলার সংস্কৃতিতে স্থান করে নিয়েছিল। এই গানের নাম ঠুংরি। কথিত আছে লখনউ-এর নবাব ওয়াজেদ আলিশাহ ঠুংরি গানের প্রবর্তক। অন্যমতে উত্তরপ্রদেশের প্রচলিত লোকসঙ্গীত চৈতী ও কাজরী গানের রূপান্তরই ঠুংরি। কেউ কেউ মনে করেন ঠুংরি একটি স্বতন্ত্র রাগিনী, কেউ মনে করেন এটি একটি তাল। এর উৎসরূপে বাইজি সংগীতকেউ নির্দেশ করে কেউ কেউ। মোটের ওপর আকারে ছোটো, বৈচিত্রপূর্ণ চটুল প্রকৃতির গান ঠুংরি। ঠুংরিতে একই গানেফ একই পঙক্তিতে দুই তিন রকম রাগের সুদক্ষ মিশ্রণ ঘটে। একে বলা হয় জংলা। ত্রিকাল, যৎ, আদ্দা, কাওয়ালি, দাদরা, ঠুংরি, কাহারবা ইত্যাদি তাল এবং ভৈরবী, পিলু, মান্ড, ঝিঁঝিট। খাম্বাজ, দেশ, বেহাগ, কাফি, তিলক-কামোদ, গারা ইত্যাদি রাগ সাধারণত ঠুংরি গানে ব্যবহৃত হয়। ১৮৫৬ সালে ওয়াজেদ আলি শাহ-র কলকাতা আগমনের পরেই মেটিয়ব্রুজকে কেন্দ্র করে ঠুংরি গানের প্রসার ঘটে। বড়ে গুলাম আলি খাঁ, গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ ঠুংরিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। পরববর্তীকালে বাংলা ঠুংরির গায়ক হিসাবে বেগম আখতার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, অজয় চক্রবর্তী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট